গরম

সেবারও এমনি গুমোট গরম পড়েছিল। সন্ধ্যের দিকে আর থাকতে পারেনি সুমিতা। কেমিস্ট্রির বই আর শীতলপাটি বগলদাবা করে এগিয়ে গিয়েছিল সিঁড়ির দিকে। পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন মা।

"কোথায় চললি?"

"ছাদে। গরমে মরে যাবো নইলে।"

মা কি একটা চিন্তা করলেন। কিন্তু মুখে কিছু বলেননি আর। পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে গেল সুমিতা। ছাদে সিঁড়ির মুখে সিমেন্ট বাঁধানো জায়গাটাতে শীতলপাটি বিছিয়ে বসে তারপর বইখানা তুলে নিলো হাতে। খোলা হাওয়ায় যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। নীচে আর উপরে আকাশ পাতাল তফাৎ। গরমকালে সন্ধ্যেবেলা ছাদে আসা মানে নিখরচায় শিমলা দার্জিলিং বেড়াতে যাওয়া। মাত্র ক'টা সিঁড়ির ব্যবধান। অথচ ----

ওদের বাড়ির মুখোমুখি একটা দোতলা বাড়ি। দোতলার বারান্দা আর সুমিতাদের ছাদের মধ্যে কয়েক হাতের ব্যবধান মাত্র। সরু বারান্দার লাগোয়া একখানা ঘর। একটি যুবক মুখের সামনে বই খুলে দুলে দুলে পড়া মুখস্ত করছিল। পড়া থামিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে সুমিতাকে দেখলো। তারপর বই রেখে উঠে এলো বারান্দার রেলিঙের কাছে। মনে মনে প্রমাদ গুনলো সুমিতা। ও কি নীচে চলে যাবে? মা যে এই কারণেই সিঁড়ির মুখে ওর পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ সুমিতা। আর এই কারণেই শিমলা-দার্জিলিং থেকে মাত্র ক'টা সিঁড়ির ফারাকে থেকেও বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনের বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত সে।

সামনের বাড়ির ওই যুবকটি ও-বাড়ির মালিক শিউপূজন মিশিরের ছেলে রামভজন। গত ক'বছর যাবৎ ম্যাট্রিক পরীক্ষা উৎরোনোর প্রচেষ্টায় একনিষ্ঠ একলব্যের মত একাগ্র সাধনায় রত থেকেও কিছুতেই

আর সিদ্ধিলাভ করে উঠতে পারছে না। ক্রমাগত রগড়াচ্ছে। ইংরাজী আর অঙ্কের যৌথ যুপকাষ্ঠে প্রতিবারই বলি পড়েছে বেচারার সাফল্যের সকল উচ্চাশা। এরই ফাঁকে ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ এনেছেন মিশিরজী। সেই বউ ক্রমান্বয়ে গুটি কয়েক বংশধরের আমদানি করেছে এবং পুনঃ গর্ভবতী হয়ে পিত্রালয়ে প্রেরিত হয়েছে সম্প্রতি। এই রামভজনের উৎপাতেই ছাদে ওঠা দায় হয়েছে সুমিতার। চোখ মটকানো, শিষ দেওয়া, আবেগভরা গান এবং শেষমেশ চিঠি ফেলা। নালিশ করে লাভ নেই। পাড়াভর্তি রামভজন ছড়িয়ে আছে চতুর্দিকে। নেহাত মুখোমুখি বাড়ি নয় তাদের, তাই। আসলে এই পাণ্ডববর্জিত শহরতলিতে এক যুবতী কুমারী মেয়ের এভাবে ছাদে উঠে হাওয়া খাওয়া এক আজব ব্যাপার। এবংবিধ ক্ষেত্রে ওরা নিজেদের ভূমিকা গুলিয়ে ফেলে খাপছাড়া অদ্ভুত সব আচরণ করতে থাকে খুব সম্ভবত দিশেহারা হয়েই।

কেমিস্ট্রির বই বন্ধ করে শীতলপাটি গুটিয়ে ফেলবে কিনা মনে মনে তাই ভাবছিল সুমিতা। এমন সময় অকস্মাৎ রামভজন এমন একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করলো যে পাটি-বই ফেলে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে হাঁপাতে লাগলো সে। মা রান্নাঘর থেকে মুখ বার করে ওকে দেখলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য করলেন না। সুমিতা বুঝলো গত দু'বছরে কলকাতায় হস্টেলে থেকে ওর দৃষ্টিভঙ্গি মনোভাব ও চালচলনে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত। রামভজন ও তার সাঙ্গপাঙ্গ অধ্যুষিত এ দেশ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে।

সাত বছর আগের কথা সে সব। লোড শেডিং-এ মুমূর্ষু জৈষ্ঠের খরতপ্ত বিকেলে দু'বছরের বুবলুকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে তার লুব্ধ দৃষ্টি বারে বারে চলে যায় ছাদের সিঁড়ি ক'টার দিকে। আর অতীতের সেই টুকরো স্মৃতিগুলো ভেসে আসে এলোমেলোভাবে। ঘুমন্ত বুবলু কঁকিয়ে উঠলো। সুমিতা ছেলেকে কোলে তুলে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গেল। দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে চললো সে। চুলোয় যাক রামভজন। যা করার করুক সে। তা বলে বাচ্চাটাকে এই ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হতে দিতে পারবে না সুমিতা। দিল্লী থেকে গতকাল এখানে এসে পৌঁছেছে তারা। ওর স্বামী চঞ্চল দু'মাসের একটা কোর্সে বম্বে গেছে। সুমিতা চলে এসেছে এখানে। ছাদে উঠে সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় একটা মোটা চার ভাঁজ করা সুজনি পেতে বুবলুকে শুইয়ে তার পাশে বসলো সুমিতা। স্নিগ্ধ হাওয়া যেন চন্দনের প্রলেপ বুলিয়ে দিচ্ছে গায়ে। বুবলুর

ঘুমন্ত মুখে কান্নার রেশ মিলিয়ে গিয়ে তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠলো। হাত পা ছড়িয়ে গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হল সে।

সামনের বাড়ির বারান্দা থেকে মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হাঁটাচলা, জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার আওয়াজ, টুকরো কথাবার্তা আর শিশুকন্ঠের কল কাকলি। রামভজনের কীর্তিকলাপ স্মরণ করে ওদিকে পিঠ করে বসেছিল সুমিতা। অন্য রকম পরিবেশের আভাস পেয়ে কৌতুহলী দৃষ্টি ফেরালো। একটি অল্পবয়সী বউ তোলা উনোনে ছ্যাঁক ছ্যোঁক করে রান্না করছে। বারান্দার চালে লম্বা দড়িতে টাঙানো বেতের দোলনায় শুয়ে একটা বাচ্চা নানারকম আওয়াজ করে চলেছে একটানা। পক্ককেশ, দোহারা চেহারার একটা লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দার রেলিঙ ঘেঁষে দাঁড়ালো। লোকটার পরনে হাতকাটা গেঞ্জি ও ছোট সাইজের একটা তোয়ালে। এত ছোট সাইজের যে তোয়ালের দুই প্রান্ত কোমরের কাছে কোন মতে মিলিত হলেও পুরোপুরি আব্রু রক্ষা হয়নি। গোলাপী অন্তর্বাসের অনেকখানিই বেরিয়ে আছে। চকিতে রামভজনের কথা আবার মনে পড়ে গেল সুমিতার। তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিলো সে। কিন্তু লোকটা এদিকে দৃকপাত করলো না। রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে রাস্তার দিকে কি যেন দেখতে লাগলো। তারপর বউটাকে কিছু বললো। বউটা রান্না ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। এতক্ষণে লক্ষ্য করলো সুমিতা বউটা আসন্নপ্রসবা। ভারী পেট নিয়ে ধীরে ধীরে লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালো। গা ঘেঁষে রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে নীচে রাস্তার দিকে চেয়ে কি জানি কি বলাবলি করতে লাগলো দু'জনে।

রাত্রে মা'কে প্রশ্ন করে জানলো ওরা নাকি শিউপূজনবাবুর নতুন ভাড়াটে। গত বছর এসেছে। রামভজন ম্যাট্রিকটা কিছুতেই আর পাশ করতে পারেনি। শেষে মরিয়া হয়ে অন্য উপায় ঠাউরেছিল। পরীক্ষার হলে হাতে-নাতে ধরা পড়ে রাস্টিকেট হয়েছে তিন বছরের মত। ওর শ্বশুরের অনেক জমিজমা আছে। বাপের তাড়নায় উত্যক্ত হয়ে শ্বশুরালয়ে গিয়ে চাষবাসে সাহায্য করছে শ্বশুরকে। তিন বছর কেটে গেলে ফিরে এসে আবার পরীক্ষার তোড়জোড় আরম্ভ করবে কিনা এখনও ঠিক নেই। তবে তদবধি ঘরখানাকে ফেলে রাখতে চাননি মিশিরজী। ভাড়াটে বসিয়েছেন। যে কটা টাকা ঘরে আসে ! মা আর বিশদভাবে কিছু বলেননি সুমিতাকে। বললো রামদুলারি, ওদের মান্ধাতার আমলের ঠিকে ঝি।

রামদুলারি বললো সামনের বাড়ির ভাড়াটে বুড়ো দেড়হাতি গামছা পরে ঘুরলে কি হবে, লোকটা টাকার কুমীর। ওর তিনটে ট্যাক্সি আছে, আটাকল আছে। বহিয়ারায় বিরাট কোঠাবাড়িতে বউ ছেলেপুলে নাতি নাতনি নিয়ে সংসার রয়েছে লোকটার। এ বউটা নাকি বউ নয় মোটে, রক্ষিতা। দ্বারভাঙ্গার মেলা থেকে দু'বছর আগে কিনে এনেছে মেয়েছেলেটাকে। এনে তুলেছে শিউপূজন মিশিরের বাড়ির ওই একখানা কুঠরি আর একফালি বারান্দার সঙ্কীর্ণ গৃহস্থালিতে। তবে মিশিরের ওই ঘরখানা উর্বর। দু'বছর পুরতে না পুরতে দু' দু'বার পোয়াতি হয়ে গেল মেয়েটা। রামভজনের বউয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

মা রান্নাঘর থেকে ধমক দিতে চুপ করলো রামদুলারি।

মা সুমিতাকে বললেন, "পাঁচ লোকে পাঁচ কথা বলে। তবে আমি তো দু'বছর থেকে দেখছি। ভারী শান্ত সংসারী মেয়ে। কোন দিকে কোন বেচাল দেখিনি কোন দিন। বাচ্চাটাকে কি যত্নটাই না করে ! রাতে ছেলে কাঁদলে বাপ চটে গজগজ করে, চড় চাপড়ও লাগায় বোধহয়। বউটা তাই ছেলে কোলে করে বারান্দায় পায়চারী করে ঘন্টার পর ঘন্টা। ঘুম নেই, ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। ওই দেড়খানা ঘরের মধ্যে পড়ে আছে সারাদিন। কোনদিন বাড়ির বাইরে পা দিতে দেখলাম না। সমস্ত দিন খেটে চলেছে অথচ মুখে হাসি লেগে আছে সব সময়। সংসারটা যেন ওর প্রাণ। অল্প যা কিছু আছে গুছিয়ে যত্ন করে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে সব সময়। লোকটার পান থেকে চুন খসতে দেয় না। যখন যা চাই সব হাতে হাতে এগিয়ে দিচ্ছে তৎক্ষণাৎ। এখন বিয়ে করা বউ, কি বিয়ে না করা, সে তথ্যে বাইরের লোকের কি প্রয়োজন?"

সুমিতা মার কথায় তখনকার মত সায় দিলেও রামদুলারির কথাগুলো উড়িয়ে দিতে পারেনি। পাঁচ বাড়ি ঠিকে কাজ করে রামদুলারি। অনেক খবরই রাখে সে। একেবারে মনগড়া কথা নিশ্চয়ই বলেনি। রামভজনের ভয় নেই। নিশ্চিন্ত মনে যখন তখন ছাদে যায় সুমিতা আর একমনে সামনের বাড়ির গৃহস্থালি দেখে।

আষাঢ় গিয়ে শ্রাবণ এলো। আকাশ ভাঙা জলের তোড়ে যেন

ভেসে যাবে সারা সংসার। পাঁচ দিন ধরে এক নাগাড়ে বৃষ্টি। থামার কোন লক্ষণই নেই।

মা আক্ষেপ করেন, "মেয়েটা অতদূর থেকে এসেছে এ্যাদ্দিন পরে। কোথায় ভালমন্দ রেঁধে খাওয়াবো, তা নয় রোজদিন পোস্তো আর ডালের বড়া খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল বেচারার। রাস্তায় এক হাঁটু জল। দোকানপাট বসবে কোথায় আর সে দোকানে যাবেই বা কে?"

এর মধ্যে একদিন অনেক বেলা অবধি রামদুলারির দেখা নেই। এত বর্ষা-দুর্যোগে একদিনও কামাই করেনি সে। পরণের শাড়ি গুটিয়ে কোমরে ফেরতা দিয়ে বেঁধে সরু সরু অপুষ্ট উরোদ অনাবৃত করে অক্লেশে জল কেটে হেঁটে এসেছে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে।

ফোকলা মুখে হেসে বলেছে, "খোকি এখানে আর কি জল জমেছে! দেখে এসো গিয়ে আমাদের গাঁয়ে। কাহারদের অর্ধেকের উপর ঘর ধ্বসে গেছে বৃষ্টির তোড়ে ----।"

সেদিন দেরী দেখে ওরা ভেবেছিল নির্ঘাত বুড়ি রোগে পড়েছে এবার। বুড়ো হাড় আর কাহাতক সইতে পারে। কিন্তু বিকেল হতেই দিব্যি এসে হাজির। জ্বরজারির চিহ্নমাত্র নেই।

মা বললেন, "ওবেলা আসিসনি কেন?"

বললো, "এসেছিলাম মাইজী, দরজার কাছ থেকে মিশিরজী ধরে নিয়ে গেল। দোতলার বউটা রাত্তির থেকে ব্যথায় কাতরাচ্ছে, দেখার কেউ নেই। মিশিরজী বললো, শেষে ওদের বাড়ির উপর যদি কিছু ঘটে যায় বাড়ির বদনাম হয়ে যাবে। এরপর আর কেউ আসতে চাইবে না সহজে। সারাটা দিন অনেক মেহনৎ করে খালাস করে এলাম বউটাকে।"

রামদুলারি উঠোন পার হয়ে ঘরে ঢোকার উপক্রম করতে মা খুন্তি হাতে ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়ালেন, "হ্যাঁরে, তোর কি বাণে-জলে আক্কেল হরে গেল নাকি? আঁতুড় কেড়ে অমনি সোজা ঘরে ঢুকছিস্, চান করবি নে?"

রামদুলারি গালে হাত দিয়ে বলে, "বল কি মাইজী, আবার চান? বৃষ্টির মধ্যে হাঁটুজল কেটে রাস্তা পার হলাম ভিজে ঝাপুস হয়ে, সে তো চানের বাবা গো !"

সুমিতার মা ওর কথায় কর্ণপাত না করে একখানা পুরোণো শাড়ি দরজার কাছে রেখে বললেন, "তামাশা ছেড়ে চান করে কাপড় পাল্টাও। তবে চৌকাঠ মাড়াবে।"

এই অপ্রত্যাশিত শাড়ি প্রাপ্তিতে রামদুলারির তোবড়ানো গালে খুশির রঙ লাগে। তড়িঘড়ি কলতলার দিকে ছোটে সে। সুমিতার কৌতুহলের শেষ নেই। বৃষ্টির জন্যে ক'দিন ছাদে যেতে পারেনি। রামদুলারিকে ডেকে খুঁটিনাটি খবর আদায় করে। বউটার নাকি আরেকটা পুত্রসন্তান হয়েছে। খুব নেতিয়ে পড়েছে। দেখাশোনা করার কেউ নেই। বড় বাচ্চাটাকেও দেখতে হচ্ছে ওকেই।

"কেন, সেই পাকাচুল লোকটা কোথায় গেল? ওই বাচ্চা দুটোর বাবা?" সুমিতা অবাক হয়ে শুধোয়।

রামদুলারি বললো লোকটা নাকি ক'দিন ধরে জ্বরে বেহুঁশ। ট্যাঁকে টাকা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার বদ্যি ডাকার লোক নেই। চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে, এর মধ্যে কোথায় ডাক্তার আর কোথায় কি!

সুমিতার বড় কষ্ট হয় বউটার জন্যে। আহা কি আতান্তরেই পড়েছে বেচারী। বড় ছেলেটার এখনও বছর পেরোয়নি। তার পিছনেই তো সারাদিন খাটনি। আজ আবার আর একটি এলো। আর ওই সাদা-চুল লোকটা, বিয়ে করা স্বামী হোক বা না হোক অন্তত কিছুটা সেবা যত্ন করতোই। মেয়েলোকটার উপর টান না থাকলে আর বহিয়ারার কোঠাবাড়ি জমজমাট সংসার ফেলে পড়ে থাকতো না এই এক চিলতে ঘরে। তা সেও রোগে পড়লো, কাঁচা পোয়াতির ঘাড়ে সব দায়দায়িত্ব ফেলে।

পরদিন সকাল হতেই সূর্যদেব উঠলেন। এ সপ্তাহের প্রথম সূর্যোদয়। অন্তত দৃশ্যতঃ। সামনের বাড়ি বহু লোকজন আসা যাওয়া করছে। চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, দোতলা থেকেই। সুমিতা ছাদে এসে দেখে বারান্দার এক পাশে বউটা চুপ করে বসে আছে। গতকালের বিয়োনো বাচ্চাটাকে কাঁথায় জড়িয়ে বুকে চেপে রয়েছে দুই হাতে। বড় ছেলেটা তার কোলে শুয়ে আছে। কয়েকজন লোক হাত নেড়ে চোখ পাকিয়ে শাসাচ্ছে বউটাকে। ঘরের দরজার কাছে বাইশ তেইশ বছরের একটা

ছেলে ছবির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে এদিক পানে চেয়ে। তার পাশে এক প্রৌঢ়া মহিলা একগলা ঘোমটার নীচে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। ওখানে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগলো সুমিতার। এক মাথা প্রশ্ন নিয়ে নীচে নেমে এলো সে। রামদুলারি আসতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। পাকাচুল লোকটা নাকি কাল রাত্রে মারা গেছে। খবর পেয়ে তার বউ ছেলে এসে পৌঁছেছে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে। তারা বলছে টাকাকড়ির লোভে এই মেয়েলোকটাই বিষ দিয়েছে তাকে।

"তোর কি মনে হয়?"

সুমিতার প্রশ্ন শুনে রামদুলারি হকচকিয়ে গেল।

তারপর হাত নেড়ে বললো, "বিষ দেবে কি, বেচারা তো নিজেই তখন ব্যথায় অচৈতন্য ! নেহাত আমি ছিলাম বলে প্রসব হতে পারলো। অন্য কারো সাধ্যি ছিল না ওই বাচ্চাকে টেনে বার করে। ও তো মায়ের পেটেই মরে থাকতো, ওই মেয়েছেলেটাই কি বাঁচতো তা হলে? আর মরে ভূত হলে টাকাকড়ি দিয়ে করতোটা কি যে তার জন্যে বিষ দিয়ে মরদকে মারবে ! ওরই তো ক্ষতি হল। আশ্রয়টুকু ঘুঁচলো। এখন আর ওকে পুছবে কে?"

"কেন, ওই বাচ্চাদুটোর বাপ কিছু দিয়ে যায়নি? অত টাকা, তিনটে ট্যাক্সি, আটাকল। সমস্ত দিনরাত্রি এর কাছেই তো কাটাতো বউ-ছেলে-নাতিনাতনি ফেলে।"

রামদুলারি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো।

তারপর বললো, "তা বটে খোকি। দুনিয়ার হালচাল বোঝা শক্ত। হয়তো সব সম্পত্তি বাড়িঘর আটার কল ট্যাক্সি সবই এই মেয়েলোকটাকে লিখে দিয়ে গেছে বুড়ো। বলা যায় না, বুড়োকালে জোয়ান মেয়েমানুষ পেয়ে হয়তো মাথা ঘুরে গিয়েছিল মিনসের। সবকিছু হাতে তুলে দিয়েছে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে। পুরুষমানুষের উপর কি কিছু আস্থা আছে?"

মা তাড়া দেন, "এই রামদুলারি ! কাজকর্ম করবি, না শুধু লেকচার দিবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?"

দোতলার বউটার কথা নিয়ে আর বেশী মাথা ঘামানোর অবসর পায়নি সুমিতা। সেদিন বিকেলেই চঞ্চল এসে পৌঁছলো বম্বে থেকে কোর্স শেষ করে। এবং পরদিন সুমিতা ও বুবলুকে নিয়ে দিল্লী রওনা হল।

দিল্লীতে নিজের সংসারে এসে নানা ব্যস্ততার মাঝে সেই মেয়েটিকে প্রায় ভুলেই গেছিল সুমিতা, যে তার অলস দিনগুলিতে খানিকটা বৈচিত্র এনে দিয়েছিল। তবে একেবারে ভোলেনি। বাবা-মা হরিদ্বার যাবার পথে দিল্লীতে ওদের কাছে ক'দিনের জন্যে এলে নানা কথার মাঝে সেই বউটার কথা জিজ্ঞেস করেছিল মা'কে। মা নীরস গলায় জানিয়েছিলেন যে বউটা এখনও সেখানেই আছে তবে বুড়ো তাকে টাকাকড়ি কিছুই দিয়ে যায়নি। তার সাবেক বউছেলেরাই পেয়েছে সব। এমনকি বউটার বাচ্চাদুটোরও কোন ব্যবস্থা করে যায়নি লোকটা। মা কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুমিতা বুঝলো এ বিষয়ে আর কিছু বলতে বা শুনতে মা'র ভাল লাগবে না। তাই সে প্রসঙ্গ সেখানেই শেষ হতে দিয়েছিল সে। কিন্তু যাকে নিয়ে প্রসঙ্গ সে শেষ হয়ে যায়নি।

আরও দু'বছর পর, বুবলু নার্সারি স্কুলে যেতে শুরু করেছে সবে, সুমিতা টের পেলো সে আবার মা হতে চলেছে। তার চেনা জানা মহলে সাড়া পড়ে গেল। অভিনন্দন-উপহার-প্রীতিভোজের আনন্দোচ্ছ্বাসের মাঝে যার অভাব বড় বেশী অনুভব করলো সুমিতা, সে তার মা। স্বামীর বুকভরা ভালবাসা আছে, অফিসে ছুটি নেই। পয়সা ঢেলে আয়া-গভর্নেস পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না নিশ্চিন্ততা আর অগাধ বিশ্বাস।

চঞ্চল বললো, "চলো তবে তোমায় তোমার মা-বাবা'র কাছেই রেখে আসি। ফার্স্ট ডেলিভারিটাই বেশী চিন্তার, তখনো তো ওখানেই ছিলে। আমি বরং দিন দশেকের ছুটির চেষ্টা করবো সে সময় যাতে তোমার পাশে থাকতে পারি।" সুমিতা ও বুবলুকে পৌঁছে দিয়ে পরদিনই দিল্লী ফিরে গেল চঞ্চল। আর সুমিতা অনেক বছর আগের সেই দায়বিহীন মেয়ের মত নিজেকে মায়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল।

ডাক্তার বিধান দিয়েছেন সকাল বিকেল অনেকখানি করে হাঁটতে। কিন্তু হেঁটে বেড়ানোর উপায় কোথায় এই রামভজনের দেশে? অতএব অগতির গতি সেই ছাদ। সিঁড়ি ভাঙাটা অবশ্য স্বাস্থ্যকর নয় এসময়, তবে সিঁড়ির সংখ্যা খুব কম। রেলিং ধরে আস্তে আস্তে ওঠে সুমিতা এবং বারবার চড়াই-উৎরাই এড়াতে এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ সময় কাটায় ছাদে। অবশ্য সবটাই হেঁটে নয়। খানিকক্ষণ পায়চারি করে বসে পড়ে। জিরোয় বসে বসে। তারপর আবার হাঁটে, আবার জিরোয়। প্রথম ক'দিন ভোরবেলা গেছিল। বুবলু ঘুম থেকে ওঠার আগেই হাঁটা-পর্ব সেরে নীচে নেমে এসেছে। সামনের বাড়ির দোতলার বাসিন্দাদের দেখেনি সুমিতা।

রামদুলারি আর নেই, গত শীতে মারা গেছে নিমুনিয়া হয়ে। পাড়ার খবর বিশদভাবে তাকে জানাবার মত কেউ নেই আর। বিশেষত নিষিদ্ধ খবর। মা এখনও আগের মত সেন্সর করা সমাচার শোনান শুধু। অপ্রিয় আলোচনা পছন্দ করেন না আদপেই। তাই দোতলার বউটার কথা ও এবার কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

সেদিন বিকেলবেলা ছাদে উঠে সামনের বারান্দায় বহুদিন আগেকার সেই পরিচিত পরিবেশ দেখে ভালো লাগলো সুমিতার। বারান্দার ছাদ থেকে দোলনা ঝুলছে। তাতে শুয়ে একটা বাচ্চা নানাবিধ শব্দ করে চলেছে একটানা। বছর দুয়েকের একটা ছেলে রঙচঙে পুতুল নিয়ে খেলছে। বউটা তোলা উনোনে ছ্যাঁক ছোঁক করে রান্না করছে। একটা ছোট ছেলে মাটিতে বই খাতা বিছিয়ে বসেছে। মাঝে মাঝেই বই থেকে মুখ তুলে মা এবং ভাইয়ের সঙ্গে দু'একটা কথা বলছে। সুমিতার কয়েক বছর আগের একটা দৃশ্য মনে পড়লো। পাকা চুল, অপরিসর তোয়ালে পরিহিত সেই মানুষটা; সে থাকলেই সামনের বারান্দার গৃহস্থালির ছবিটা সম্পূর্ণ হত, আর কোন ফাঁক থাকতো না। অলস মস্তিষ্কে অবান্তর চিন্তাটা অঙ্কুরিত হবার সাথে সাথে বারান্দার সামনে ঘরের দরজায় একটি পুরুষ আত্মপ্রকাশ করলো। ডোরাকাটা পাজামা পরা খালি গায়ে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের একটা ছিপছিপে লোক রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়ালো। চকিতে সুমিতার মনে পড়ে গেল লোকটা ওর একেবারে অপরিচিত নয়। ওই বারান্দাতেই বছর দুয়েক আগে দেখেছে ওকে। সেদিন ওর সঙ্গে আরও লোকজন ছিল। তারা বউটাকে লক্ষ্য করে তর্জন গর্জন করছিল। এ যুবকটি কথা কয়নি। বিহ্বল মুখে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। সুমিতা পরে শুনেছিল ও নাকি পাকাচুলোর ছেলে।

পাজামা পরা লোকটা রেলিঙ ধরে ঝুঁকে নীচে কি যেন দেখলো। তারপর বউটার দিকে চেয়ে কিছু বললো। বউটা উঠে দাঁড়ালো। শাড়ির আবরণ ভেদ করে আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ উপছে উঠছে। ধীরে ধীরে রেলিঙের কাছে এসে লোকটার গা ঘেঁষে দাঁড়ালো বউটা। নীচের দিকে চেয়ে দু'জনে নিবিষ্ট মনে কি যেন দেখতে লাগলো। সুমিতা আর দাঁড়ালো না। ভারী শরীরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে এলো। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলো।

মা রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন, "কি হল? এখনি চলে এলি যে?"

সুমিতা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "গরম। ছাদে বড্ড গরম।"

মা বললেন, "কাল থেকে উঠোনে পায়চারি করিস। সিঁড়ি ভেঙে আর কাজ নেই তোর।"

সুমিতা চুপ করে রইলো।